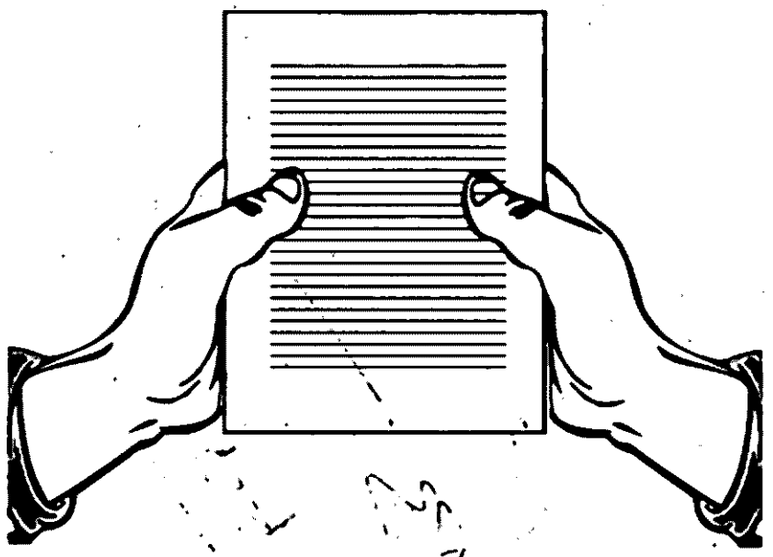

প্রশ্ন ফাঁসকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক

এম এইচ খান মঞ্জু

শিক্ষার্থী কিংবা চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয় মেধা যাচাইয়ের জন্য। কিন্তু প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা এখন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। পরীক্ষার আগেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে যারা তাদের পকেটে জমা হচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

কারও জন্য পৌষমাস হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস সত্যিকারের মেধাবীদের জন্য সর্বনাশ হয়ে দেখা দিচ্ছে। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের ওপর ভরসা করে কেউ কেউ সহজেই বৈতরণী পার হচ্ছে। মেধাবী না হয়েও তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ভর্তি হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। দুর্নীতির সুবাদে চাকরির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। আর সত্যিকারের মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছে প্রাপ্য সুযোগ থেকে। কারণ এক অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। পরীক্ষার্থীদের একাংশ ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র কিনে সঠিক জবাব রপ্ত করে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। বৃহত্তর অংশকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিকতার কঠিন পথে।

জেএসসি, পিএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়েও যে কারণে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্কুল-কলেজের ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা একটি অলঙ্ঘনীয় বিধয়। আমাদের সমাজব্যবস্থায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বাঁধলেও মাত্র কয়েক বছর আগেও এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। কিন্তু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং তা মুদ্রণ ও সংরক্ষণ কাজে যারা নিয়োজিত তাদের মধ্যে অনৈতিক লোকজন ঠাঁই পাওয়ায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় সব পরীক্ষা কার্যত প্রহসনে পরিণত হতে যাচ্ছে। অষ্টম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এবং তা টাকার বিনিময়ে বিক্রির মহোৎসব চলছে। শিশুরা শিশু বয়সেই পরিচিত হচ্ছে দুর্নীতির সঙ্গে। জাতির ভবিষ্যৎ যারা, তারা শিশু বয়সেই দুর্নীতির পথে হয় নিমজ্জিত নতুবা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে নেতিবাচক মনোভাব।

শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১০ সালে প্রবর্তিত জাতীয়ভাবে একক প্রশ্নপত্র দিয়ে মেধা যাচাইয়ের এই আয়োজন কেবল অভিভাবক নয়, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ জাগিয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল—এক অর্থে শিক্ষাজীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালের পাঠ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও অসাধু উপায়ের কালো ছায়া থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। একটি গোষ্ঠী অর্থের লোভে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে গরল ঢালতে উদ্যত। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় মেধা, সততা ও স্বচ্ছতার শিক্ষা নিয়ে যেখানে পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষাগুলো কলুষমুক্ত থাকার কথা ছিল, সেখানে উচ্চতর পরীক্ষাগুলোর নেতিবাচক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছে সোনামণিরা। আত্মঘাতী এই চর্চায় বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার অবকাশ নেই।

আমরা শিক্ষকরা চাই—প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ এর পুনরাবৃত্তির দুঃসাহস না দেখায়। পাশাপাশি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার অভিভাবকদেরও আত্মোপলব্ধি জরুরি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছেছে অভিভাবক পর্যায়ের ব্যক্তিদের হাতে করেই।

আমার মতে, প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে হলে অভিভাবকদের সতর্কতা ও সচেতনতার বিকল্প নেই। তাদের মনে রাখতে হবে—আজকের ছোট অন্যায়ই পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যটিকে আগামীকাল বড় অন্যায়ের পানে ধাবিত করতে পারে। সেটা দেশ, সমাজ, পরিবার কারও জন্যই মঙ্গলজনক হতে পারে না। তবে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা চাই খোদ প্রশাসনে। প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক, কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না। এখন তারা কী করেন, সেদিকে আমাদের কড়া নজর থাকবে। অবিলম্বে দোষীরা আটক হলে এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ না উঠলেই কেবল আমরা বুঝবো, প্রথম অঘটনেই কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে।

আমরা অধঃপতনের কোন গহ্বরে পতিত হতে যাচ্ছি তা সহজেই অনুমেয়। পরীক্ষার আগেই যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়, তবে পরীক্ষা নামের প্রহসনের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা ভেবে দেখা উচিত। প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রক্রিয়ায় যারাই জড়িত থাক তাদের আইনের আওতায় আনা সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত। প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষাও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গোপালগঞ্জ